বনলতা সেন

এ.এফ.এম. ফতেউল বারী রাজা

'বনলতা সেন' প্রকৃতি প্রেমিক জীবনানন্দ দাশের অমর এবং অনবদ্য সৃষ্টি। কবিতাটি ১৯৩৩ সালে কবি লিখে থাকলেও বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ ১৩৪২ সংখ্যায় (ডিসেম্বর, ১৯৩৫) প্রকাশিত হয়। এরপরই তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। তাঁর কম-বেশি সব কবিতাই উপভোগ্য। যাতে রূপক শব্দের ব্যবহারসহ চিত্রকল্প সৃষ্টি করতে পেরেছেন। তিনি কল্পনার ফানুসে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে এবং আরও দুরে বহুদুরে পরিভ্রমণ করেছেন। এরপরও তিনি বাংলাকে ভুলেননি। বাংলার প্রকৃতিকে ভুলেননি। তাই তিনি 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন এই বলে:

"আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে– এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়– হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে।"

রূপসী বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তিনি লক্ষ্য করেছিলেন অত্যন্ত গভীরভাবে। আর সেজন্যেই কবি বলেছেন: "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।"

দেশ ও নারী প্রকৃতির প্রতীক, ভালোবাসার প্রতীক বা প্রেমের প্রতীক। মানুষ যেখানেই যাক পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাক দেশের টানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে, ভালোবাসার টানে আবার স্বদেশভূমিতে ফিরে আসতে বাধ্য। মধু কবি ইংরেজ সাজতে বিলেতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পারেননি। দেশের টানে, বাংলার প্রকৃতির ভালোবাসার টানে বাঙালি হিসেবেই দেশে ফিরে এসেছেন। বনলতা সেন জীবনানন্দ দাশের প্রেমাসম্পদ বা প্রেমের কবিতা। মানুষ সারাদিন কায়িক পরিশ্রম করে রাতে ফিরে আসে তার আবাসে স্বস্তির জন্যে, বিশ্রামের জন্যে, নির্ভয় আশ্রয়ের জন্যে। পাখি দিনশেষে ফিরে আসে নির্ভয় আশ্রয়ে নীড়ে, শান্তির জন্যে, স্বস্তির জন্যে, বিশ্রামের জন্যে। 'বনলতা সেন' কবিতায় বনলতা সেনের দু'টি চোখকে কবি পাখির বাসার মত উল্লেখ করেছেন। এখানে পাখির বাসা রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই সহজেই বুঝা যায় বনলতা সেন কবির প্রেমিকা। সারাদিন শেষে এই প্রেমিকার চোখের দিকে তাকালেই কবি'র সকল দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা ভুলে যেতেন এবং স্বস্তি অনুভব করতেন। দীর্ঘদিন যাবৎ এই বনলতা সেনকে নিয়ে প্রশ্নের অন্ত ছিলো না। কবির প্রেমিকা কে এই বনলতা সেন? কোথায় তার বাড়ি? আদৌ কি কেউ এই নামে ছিলো? নাকি কবি'র কল্পনার কল্পরাণী? এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া যায়নি। তাছাড়া কবির জীবদ্দশায় 'বনলতা সেন' নামে কোনো রমণী এসেছিলেন বলে কোনো বাস্তব অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়নি বিধায় এটি কবির সৃষ্ট একটি কল্প চরিত্র হিসেবে বিবেচনা হয়ে আসছিলো। কিন্তু ১৯৫৪ সালে জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর ভূমেন্দ্র গুহের কল্যাণে কবির বিপুল পরিমাণ পাণ্ডুলিপি উদ্ধার হয়েছে। সাথে কয়েক বছরের দিনলিপিতুল্য লিটারেরি নোটস্ও উদ্ধার হয়েছে। জীবনানন্দ ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক। তাই সঙ্গতকারণেই এই নোটগুলো ছিলো প্রায় সাংকেতিক কায়দায় ইংরেজিতে লেখা। এসবের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি জীবনানন্দর প্রতিকৃতি কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চিরকাল নিভৃতচারী রক্তমাংসের মানুষ জীবনানন্দের জীবনেও প্রেম এসেছিলো এবং চার-চারটি নারীর প্রেমে পড়েছিলেন। এদের মধ্যে বেবী অর্থাৎ শোভনার প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিলো। নিজেকে প্রকাশ করার অক্ষমতায় কখনো বিয়ের কথা ভাবার অবকাশ হয়নি। তাই পিসেমশাই মনোমোহন চক্রবর্তী যখন লাবণ্য গুপ্ত'র সঙ্গে বিয়ের উদ্যোগ নিলেন তাতে বাধ সাধেননি জীবনানন্দ দাশ। আর সে জন্যেই লাবণ্য'র সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েও জীবনানন্দ সে প্রেম গোপনে লালন করেছেন হৃদয়ে। তবে উদ্ধারকৃত দিনলিপিতুল্য লিটারেরি নোটস্-এর ওয়াই (ণ) চিহ্নিত মেয়েটিই বনলতা সেন। যার মোহ থেকে জীবনানন্দ কখনো মুক্ত হতে পারেননি। প্রথম যৌবনেই ওয়াই-এর সাথে পরিচয় হয়েছিলো তাঁর। তখন ওয়াই ছিলো বেনী দোলানো কিশোরী মাত্র। ওয়াই আর কেউ নয়, কবির ফরেস্ট অফিসার কাকা অতুল দাশের মেয়ে শোভনা। ডাকনাম বেবী। বেবীর মিলুদা অর্থাৎ জীবনানন্দ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' কল্যাণীয়েসু লিখে শোভনাকে উৎসর্গ করেছিলেন। এক ফাঁকে শোভনাকে সে খবর জানাতেও ভুল করেননি।

ডিব্রুগড়ে শোভনাদের বাড়িতে দরজা বন্ধ করে শোভনাকে কবিতা শোনাতেন জীবনানন্দ। মা সরযুবালার আপত্তি উপেক্ষা করে আগ্রহ নিয়ে সে কবিতা শুনতো।

বরিশাল ছেড়ে কলকাতা এসেছেন জীবনানন্দ, সিটি কলেজে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে। এ সময় ডায়াসেশান কলেজে পড়ত শোভনা। ১৯৩২-এর আগস্টে লেখা 'কলকাতা ছাড়ছি' উপন্যাসটির নায়িকাও পড়ত ডায়াসেশান কলেজে। 'গ্রাম ও শহরের গল্প' উপন্যাসটির নায়িকা শচী- সে-ও তো আর কেউ নয়, জীবনানন্দের শোভনাই। 'লিটেরেরি নোটস-এ লেখা আছে ওয়াই= শচী।

হয়তো প্রাতিবেশিক নৈকট্যের সুযোগে কোনো একদিন, এক রাতে শোভনার সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হয়ে থাকবে জীবনানন্দর। শোভনাকে গভীর প্রেমে জড়িয়ে ধরেছিলেন তিনি? চিবুকে এঁকে দিয়েছিলেন আশ্লেষ চুম্বনের দাগ? হয়তো সে-ই প্রথম, সে-ই শেষ। আর তাই 'প্রেম' কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছেন: 'একদিন- একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা!/একরাত- একদিন করেছি মৃত্যুরে অবহেলা/একদিন- একরাত;-তারপর প্রেম চলে গেছে...।'

এছাড়া কবির প্রেম এবং প্রেমিকা শোভনা সম্পর্কে আরও স্বচ্ছ ধারণা জন্মে 'বনলতা সেন' কবিতাটি লেখার আগেই কবি 'কারুবাসনা' নামে যে উপন্যাসটি লুকিয়ে লিখে তোরঙ্গবন্দী করে ফেলে রেখেছিলেন তা' আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। সেই উপন্যাসে জীবনানন্দ অকপটে শোভনা প্রসঙ্গ ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মৃত্যুর তিন দশকেরও বেশি সময় পর এ উপন্যাসটি সর্বপ্রথম ১৯৮৬ সালে প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনসের সৌজন্যে জীবনানন্দ সমগ্র তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। সেখানে কবি শোভনাকে স্মরণ করেছেন এইভাবে:

'কুড়ি-বাইশ বছরের আগের সে এক পৃথিবীতে; বাবার তার লম্বা চেহারা, মাঝ-গড়নের মানুষ- শাদা দাড়ি, স্নিগ্ধ মুসলমান ফকিরের মত দেখতে; বহু দিন হয় তিনিও এ পৃথিবীতে নেই আর; কত শীতের ভোরের কুয়াশা ও রোদের সঙ্গে জড়িত সেই খড়ের ঘরখানাও নেই তাদের আজ...। তারপর অন্যত্র আবার, '... বছর আষ্টেক আগে বনলতা একবার এসেছিলো। দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চালের বাতায় হাত দিয়ে মা ও পিসিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললে সে। তারপর আঁচলে ঠোঁট ঢেকে আমার ঘরের দিকেই আসছিলো। কিন্তু কেন যেন অন্যমনস্ক নতমুখে মাঝপথে গেল থেমে, তারপর খিড়কির পুকুরের কিনারা দিয়ে, শামুক-গুগলি পায়ে মাড়িয়ে, বাঁশের জঙ্গলের ছায়ার ভেতর দিয়ে চলে গেল সে। নিবিড় জামরুল গাছটার নীচে একবার দাঁড়াল, তারপর পৌষের অন্ধকারের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।'

এ থেকে প্রতীয়মান হয়, বনলতা সেন কবিতার কল্পচিত্র নয়। এ হলো তার প্রেমিকা বা মানসপ্রতিমা বা জনম জনমের প্রিয়া, যাকে কবির প্রেম সম্রাজ্ঞী বললে অত্যুক্তি হবে না। আমার এই ছোট লেখা পাঠকের কতটুকু ভালো লেগেছে জানি না; তবে আপনাদের অনুরোধ করবো কথাশিল্পী আনিসুল হক সাহেবের 'এতদিন কোথায় ছিলেন' গ্রন্থটি পড়বেন। অবশ্যই তৃপ্ত হবেন।

লেখক পরিচিতি : সভাপতি, চাঁদপুর লেখক পরিষদ।